দৈনিক বাংলা

003

তারিখ 12.1.83
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

কিন্ডারগার্টেন নিয়ে কিছু কথা

মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লাহ

বাংলাদেশের মত জনবহুল একটি দেশে যেখানে শিক্ষার উপকরণ ও বিদ্যালয়ের অভাবে দেশের বিপুল শিক্ষার্থীদের ভাগ্যে শিক্ষার আলো জুটছে না, সেখানে যে কোনভাবে স্থাপিত একটা শিক্ষালয়কে বন্ধ করে দেবার প্রশ্নই অবান্তর, অনুচিত। এতে আরো নিরক্ষর লোকের সংখ্যাই শুধু বাড়বে। কিন্ডার গার্টেন স্কুলের ক্ষেত্রেও এ কথাটাই সমভাবে প্রযোজ্য; তবে সংস্কারের একান্তই প্রয়োজন।

কারণ, জনবহুল দরিদ্র এদেশে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে শিক্ষার নামে বিলাসিতাও চলতে পারে না। খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের অপ্রতুলতা ও অভাবের শিকারে জর্জরিত জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয় কতক ধনীর ছেলে-মেয়ে এ ধরনের স্কুলে শিক্ষা লাভ করলেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি হতে পারে না।

শিক্ষা লাভ করা দেশবাসীর সার্বজনীন একটা মৌলিক অধিকার। এ অধিকারের সুযোগে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে রাজধানীর মত কতিপয় বড় বড় শহরের বিশেষ অধিবাসীদের জন্য একটা বিশেষ ধরনের শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা কতটুকু মানানসই এবং শিক্ষার নামে এরূপ বিলাসিতা করা কতটুকু যুক্তিপূর্ণ সেটাই প্রশ্ন সাপেক্ষ।

একটা ভাড়ার বাড়ি, শিক্ষা উপকরণের অভাব, খেলাধুলার ব্যবস্থা সীমিত, বিশেষ করে মাঠের অভাব, পরিবেশের অভাব, শিক্ষকের স্বল্পতা, ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছার বাস্তবায়ন, সরকারী শিক্ষা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি নিয়ে চালিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। কেননা, শিক্ষা লাভ করা বলতে শুধুমাত্র কতক শিক্ষার্থীকে পন্ডিত করা বুঝায় না।

আবার কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শ্রেণী বিন্যাস এক অদ্ভুত রকমে সাজানো। যা শুধু বিভ্রান্তই করে না অনেক সময় অসুবিধায় ফেলে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় কোন কোন স্কুল একটা শ্রেণীকে নাম দিয়েছে কেজি, কেউ দিয়েছে নার্সারী। কোন স্কুলে প্লে গ্রুপ, কোন স্কুলে প্রি-ক্যাডেট প্রভৃতি। এই যে অমিল তা কিভাবে এড়ানো যায়? ছেলে-মেয়ে কতটা অভিজ্ঞতা লাভ করলে কেজি বা নার্সারী বা প্লে গ্রুপে পড়তে পারবে, তা বুঝা মুশকিল। অথচ সরকারীভাবে স্বীকৃত একটা বিধিব্যবস্থা আছে যা অনুসরণের মাধ্যমেই সহজে শিশু শ্রেণী বা প্রথম শ্রেণী বুঝা যায় বা দেশের বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর লোককে বুঝানো যায়।

অন্যদিকে আমাদের শহরগুলোতে ব্যক্তি মালিকানায় স্থাপিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলো যে মনোভাব নিয়ে চলছে তা ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ নয় কি? কেননা, যিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন, উনার মর্জিমাফিক কিছু লোককে নিয়ে একটা পরিচালনা কমিটি গঠন করে নিয়েছেন। সেখানে কিছু শিক্ষার্থীর ব্যবস্থা করা হলো। বছরের পর বছর একই কমিটির লোক চালনা করছে সে স্কুলটি। খাতাপত্রে, নথি কাগজে সেটা এক সময় হয়তো শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন লাভ করে থাকে, পরে হয়তো দেখা গেল অন্যরূপ। সাম্প্রতিক কতকগুলো ঘটনা তারই যথার্থ প্রমাণ। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীদের ভাগ্য নিয়ে চলে ছিনিমিনি খেলা। অভিভাবকেরা হন বিভ্রান্ত, নিজ সন্তানকে অন্যত্র ভর্তি করার জন্য শেষ পর্যন্ত উৎকোচ প্রদানের পন্থাও অবলম্বন করতে দেখা যায়। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নাই তা আমি বলছি না। তবে, এ ক্ষেত্রে ব্যয় যে অতিরিক্ত—তা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই।

সাধারণ স্কুলে একটা শ্রেণীতে অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাপের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এর জন্য দায়ী কে? যেহেতু দরিদ্র দেশ বিধায় সাধ থাকলেও সাধ্যের অভাব। নইলে যাঁরা শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত তাঁদের নিশ্চয়ই এই মনোবৃত্তি থাকে না যে একটা শিক্ষার্থীকে হাতে-কলমে শিক্ষা না দিয়ে বিদায় করা। অনিয়ম যে নাই তাও বলছি না। সরকার যেমন শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন তেমনি শিক্ষকের সার্বিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাদেরকে কষ্টে রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হতে পারে না। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকার বয়স্ক লোকদিগকে নিয়ে যে শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করেছেন—তাতে যে সুফল পাবার কথা তার চেয়ে আরো বেশি সুফল পাওয়া যেত যদি সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও শিক্ষা সামগ্রী ফ্রি বিতরণের মধ্যে রাখতেন। একজন শিশুর শিক্ষা লাভের সহজ ও সুলভ ব্যবস্থা সব সময়েই ভাবী বংশধরকে শিক্ষিত করার অন্যতম উপায় ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের নিশ্চিত সহায়।

তাছাড়া, একটা শিক্ষার্থীর বেতন যদি ১৫০/২০০ টাকা হয়, তাহলে কয়জনের পক্ষে সম্ভব নিজ সন্তানকে কিন্ডার গার্টেন স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা করা? কিন্ডার গার্টেন স্কুলের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হলেও দেশের প্রকৃত উপকার কি হচ্ছে? প্রকৃতপক্ষে এটা শিক্ষা ক্ষেত্রের একটা অপচয় এবং দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে অস্বীকার করার সামিল। এতে গ্রাম বাংলার বিপুল সংখ্যক শিশু নিরক্ষরই থেকে যাচ্ছে, আর দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে।

এজন্যই জনসংখ্যার তুলনায় যে দেশে প্রচুর সরকারী স্কুলের অভাব সে দেশে বেসরকারী বা ব্যক্তি-মালিকানায় স্থাপিত স্কুলগুলোকে বিপুল জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এবং দেশজ উপকরণে সজ্জিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে আসা দরকার। এ কাজে শিক্ষিত শ্রেণীর যেমন এগিয়ে আসা দরকার।

তেমন ধনীদের অগ্রণী ভূমিকার প্রয়োজন। ধনবানরা একটু উদারতা প্রদর্শন করলেই দেশের সর্বত্র আরো কিছু বেসরকারী খাতে স্কুল স্থাপন করা সম্ভব হতো এবং শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের একটা সহজ উপায় হতে। শুধু তা নয়। এতে দেশের বিপুল সংখ্যক শিশু নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

সুতরাং সরকারের উচিত একটা নিয়মের দ্বারা কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোকে সুসংগঠিত করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করা। যাতে শুধু শহরে নয়, গ্রাম বাংলার প্রতিটি থানায় থানায় এ ধরনের স্কুল স্থাপনে সবাই আগ্রহী হন এবং পল্লী গ্রামের প্রতিটি শিশু উন্মুক্ত পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষালাভ করতে পারবে। তখনই বলা যাবে, কিন্ডার গার্টেন স্কুল দেশের শিশুদের আলোর দিশারী।

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

কিণ্ডার গার্টেন

(৬-এর পৃঃ পর)

দেশের প্রয়োজনে, নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং গ্রাম বাংলার বিপুল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোক দানের জন্য সরকার, ধনবান ব্যক্তিবর্গ এবং স্থাপিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর কর্তৃপক্ষ মিলে যদি একটি নথিভুক্ত বিধিমালায় এ সকল স্কুল পরিচালনার ব্যবস্থাসহ গ্রামমুখী উদ্যোগ নেন তাতে অবশ্যই সবার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সহজে পূর্ণ হবে। আর দেশের ভাবী বংশধরদের শিক্ষিত করা সহজ হবে। প্রত্যেকের কাছে আমরা এরূপই কামনা করি।